Anuranan: An International Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 4: 2016

বাঙালি উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের সূত্রপাত

ড. সুভাষ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

Anuranan: An International Journal of Humanities and Social Sciences
Vol.4 originally published online November, 2016

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by

www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2016 Anuranan: An International Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Vol. 4: 2016 | **ISSN 2347-8055**

বাঙালি উদ্বাস্তুদের দেশত্যাগের সূত্রপাত

ড. সুভাষ বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশঃ

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পর থেকে ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতিতে নতুন ধরনের প্রবণতা দেখা দেয়। মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে হিন্দুদের সংগঠন আখ্যা দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়কে কংগ্রেস থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেয়। পরবর্তীকালে লীগ মুসলিমদের জন্য ভারত ভেঙে পৃথক পাকিস্তান গঠনের দাবিতে সোচ্চার হয়। ১৯৪০ সালে লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তাতেও পৃথক পাকিস্তান গঠনের প্রক্রিয়ায় বিশেষ অগ্রগতি না হওয়ায় লীগ ক্রমে সহিংস পথে অগ্রসর হয়। মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে লীগ ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়ে ব্যাপক হিন্দু নিধন করে। এর কিছুদিন পর নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় ব্যাপক হিন্দু নিধনের ঘটনা ঘটে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস দেশভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে সেখানকার বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু হিন্দু ও বৌদ্ধ নিজেদের জীবন ও ধর্মরক্ষার তাগিদে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশভাগ ও স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে যে উদ্বাস্তু স্রোত পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করতে থাকে তা মূলত শুরু হয় সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কথা ভেবে। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে সংখ্যালঘুদের উপর সামাজিক ও ধর্মীয় নির্যানত শুরু হয়। এর ফলে ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয় ব্যাপক হারে দেশত্যাগ। এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু নিজেদের মাতৃভূমি চিরদিনের মতো ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আশ্রয় নেয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এভাবে পশ্চিমবঙ্গ প্রকৃতপক্ষে একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশে পরিণত হয়।

----:----

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে পৃথক পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ববঙ্গের অগণিত হিন্দু পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসতে শুরু করে। দেশভাগের পর উদ্বাস্তুদের ব্যাপক হারে দেশত্যাগ শুরু হলেও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশত্যাগের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায় মূলত মুসলিম লীগের নেতৃত্বে সংগঠিত হওয়া ১৯৪৬ সালে কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও নোয়াখালি দাঙ্গার পর থেকেই। ১৯৪৬ সাল থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট শুক্রবার লীগের ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রামের’ দিন ঘোষিত হয়েছিল। তখন ছিল রমযান মাস। ১৯৪৬ সালের রমযান মাসে মুসলিম লীগের ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ ও কলকাতায় দাঙ্গা,

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে নোয়াখালির দাঙ্গা, ত্রিপুরায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা হিন্দুদের বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, পৃথক পাকিস্তান গঠিত হলে সেখানে যে সংখ্যালঘু মানুষজন আছেন তাদের সামনে ঘোর বিপদ। মূলত তখন থেকেই বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়েছিল। পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক শুরু হয়ে যায় ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের ঘোষিত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর সময় থেকেই। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ঘোষণা, প্রচার ও কর্মসূচি পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুদের মনে তখন থেকেই ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের একটি প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল -"মুসলমানদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, এমন এক রমযান মাসেই কোরান নাযেল হয়েছিল। এমন এক রমযান মাসেই খোদা 'জেহাদ' করার অনুমতি দেন। এমন এক রমযান মাসেই বদরের যুদ্ধ হয়েছিল। এটিই মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান নিয়ে মহানবী জয়লাভ করেছিলেন। আবার এমন এক রমযান মাসেই পবিত্র মহানবী ১০,০০০ মুসলমান নিয়ে মক্কা জয় করে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করেছিলেন; স্থাপন করেছিলেন মুসলিম কমনওয়েল্থ। মুসলিম লীগের সৌভাগ্য যে, এমন একটি পবিত্র মাসেই তাঁরা সংগ্রাম শুরু করেছে।"[i] অন্য একটি প্রচারপত্রের শিরোনাম ছিল 'জেহাদের জন্য প্রার্থনা'। তাতে বলা হয়েছিল "খোদার দয়ায় ভারতে আজ মুসলমানদের সংখ্যা ১০ কোটি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা আজ হিন্দু ও ব্রিটিশদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছি। হে মহান খোদা, আমরা এই রমযান মাসেই জেহাদ শুরু করছি। কসম খেয়ে বলছি - আমরা তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল; দেহে এবং মনে আমাদের শক্তিশালী কর; আমাদের সকল কাজে তুমি সাহার্য কর। কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী কর, ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করার সামর্থ্য দাও এবং জেহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা দাও। খোদার দয়ায় পৃথিবীর মধ্যে আমরা যেন ভারতকে সবচেয়ে বড় মুসলিম সাম্রাজ্যে পরিণত করতে পারি।" অপর একটি প্রচারপত্রে অমুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলা হয় "হে কাফেরগণ! সুখ বা গর্ব অনুভব কর না। তোমাদের শেষ বিচার বেশি দূরে নয়। সার্বিক ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে। আমাদের হাতের তরবারির দ্বারা জয়ের বিশেষ শিরোপা অর্জন করব।"[ii] 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' নির্দিষ্ট দিনের আগে থেকেই মুসলিম লীগের নেতাদের বিভিন্ন বক্তব্যে যা প্রকাশ পেয়েছিল তা পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল। জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন তিনি নীতি শাস্ত্র আলোচনা করতে যাচ্ছেন না। তিনি এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক পন্থা-পদ্ধতি পরিহার করছেন। তাঁদের হাতে পিস্তল আছে এবং তা তাঁরা ব্যবহার করবেন। লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন বলেছিলেন "আমরা যখন অহিংসায় বিশ্বাস করি না, তখন একশ' পথে যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারছি। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বলতে কি বুঝায় তা বাংলার মুসলমানরা খুব ভালভাবেই জানেন।"[iii] ১৬ই আগস্টের পূর্বেই লীগের প্রচারপত্রে এমন বক্তব্য এবং লীগের নেতাদের এমন বিবৃতির ফলে অদূর ভবিষ্যতে কী হতে পারে তা পূর্ববাংলার অন্তত কিছু সচেতন ও দূরদর্শী হিন্দু তখনই খুব ভালোভাবে জেনে গিয়েছিলেন।

'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে' কলকাতায় নিধন যজ্ঞ চালানোর পরিকল্পনা জানিয়ে জিন্না সাহেব লীগ নেতাদের গোপন নির্দেশও দিয়ে রাখলেন।[iv] সেই মতো ১৬ই আগস্ট কলকাতায় মুসলিম লীগের সভা শেষ হওয়ার পরপরই শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। টানা তিন দিন হত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের অসংখ্য ঘটনায় কলকাতায় নৈরাজ্যের শাসন চলে। অন্তত পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষ এই তিন দিনের দাঙ্গায় নৃশংসভাবে প্রাণ হারায়। দাঙ্গার চতুর্থ দিনে হিন্দু ও শিখরা প্রতিশোধ নিতে শুরু করলেই সুরাবর্দি তখন দ্রুত পুলিশ ও মিলিটারী নামিয়ে দাঙ্গা বন্ধ করেন। এর পরেও কলকাতার মুসলিমদের উপর আঘাতের একটি সম্ভাবনার আশঙ্কায় শহীদ সুরাবর্দি শঙ্কিত ছিলেন। তাই গান্ধী কলকাতার দাঙ্গার

পরিস্থিতিতে যখন কলকাতায় এলেন তখন গান্ধী শিবিরে গান্ধীজীর সঙ্গে সুরাবর্দিও উপস্থিত। "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে কলকাতায় হত্যাকাণ্ডের অপরাধ এইভাবেই মোচন করতে চান তিনি; আগের দিনই প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, কলকাতা দাঙ্গার জন্যে তিনি 'অনুতপ্ত'। সোহরাবর্দি আরও জানেন, কলকাতার মুসলমানরা এখনও নিরাপদ নয়; গুণ্ডারা এখনও ফিরে যায়নি। গান্ধীজীর পাশে থেকে মহাত্মার ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ ঠেকাতে চাইছেন সোহরাবর্দি।"[v] অথচ বাংলার হিন্দুরা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হলেন যে, জিন্না ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে এক ব্রিটিশ মন্ত্রীকে বললেন যে, কলকাতায় দাঙ্গা বাধিয়েছিল হিন্দুরাই।[vi] এতে বাংলার হিন্দুদের আতঙ্কের যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা বাংলায় তখন মুসলিম লীগের সরকার প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের ছত্রছায়াতেই কলকাতায় এমন নারকীয় দাঙ্গা হল। অবএব পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের মধ্যে সংখ্যালঘু হিন্দুদের আর নিরাপত্তা কোথায় থাকল? এই 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এ বেশির ভাগ শিকার হয়েছিল হিন্দুরাই। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কথাতে। দেশ ভাগের প্রসঙ্গে তিনি গান্ধীজীকে জানিয়েছিলেন, "*… it was the last thing (partition) I wanted to do - and don't gorget Direct Action Day in Calcutta which was the warning of what he could do. I mean he killed 5,000 people and wounded 15,000 people just as demonstration, and I think he has the capacity to cause civil war…*"[vii] এমতাবস্থায় পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের সেখানে বসবাসের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। কলকাতায় হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে হিন্দুরা যেভাবে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণের ঘটনার শিকার হল তাতে পূর্ববাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিতে হিন্দুরা তাদের জীবন ও ধর্মের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ল। মূলত তখন থেকেই পূর্ববাংলার হিন্দুদের মনে একটি আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরী হল এবং যে সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দু পূর্ববাংলায় বাস করতেন তাঁরা পশ্চিমবাংলার দিকে চলে আসার কথা ভাবতে শুরু করে দিলেন। ১৯৪৬ সালের এই পরিস্থিতিতে সাধারণত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুরাই পূর্ববাংলা ত্যাগের কথা ভাবতে পারতেন। সম্ভ্রান্ত এই হিন্দুদের অনেকেই সে যুগে তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা ও কাজের জন্য পশ্চিমবাংলায় পাঠিয়ে দিতেন। পড়াশুনা ও কাজের সূত্রে তাঁরা এখানে বসবাস করে পরবর্তীকালে তাদের পরিবার পরিজনকে পশ্চিমবাংলাতে নিয়ে আসবে- এমনটাই ছিল অনেকের পরিকল্পনা।[viii] অবশ্য তখনো সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র, অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত হিন্দুদের পক্ষে জন্মভূমি ছেড়ে আসার কথা চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। কেননা তাদের পক্ষে যেমন দীর্ঘ ও সুদূরপ্রসারী বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব ছিল তেমনি অধিকাংশ হিন্দু যারা পূর্ববাংলার মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা প্রথম ধাক্কাতেই 'দেশ' ছাড়ার কথা ভাবেনি। তাছাড়া দু' এক বারের দাঙ্গায় নিজের সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে আসা তাদের কাছে খুব সহজ কথা নয়। তাঁরা নিপীড়িত হতে পারে, কিন্তু জন্মভূমির প্রতি তাদের মমত্ব তাদের জীবন ও ধর্মের মতোই গভীর।

১৯৪৬ এর আগস্টের দাঙ্গার রক্তের দাগ শুকোতে না শুকোতেই পূর্ববাংলার হিন্দুরা ১৯৪৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে আবার এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গার শিকার হল। শ্রীদেবজ্যোতি রায় নোয়াখালি দাঙ্গার বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে-

"... মুসলিম লীগের প্রাক্তন এম. এল. এ. কুখ্যাত জেহাদী দাঙ্গাবাজ গোলাম সরোয়ারের নেতৃত্বে নোয়াখালির হিন্দু নিধন যজ্ঞের কুৎসিত (!) উদ্বোধন হয় '৪৬-এর ১০ অক্টোবর। সেদিন

ছিল বৃহস্পতিবার। হিন্দুদের লক্ষ্মীপুজোর দিন। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড সহ তার কয়েক হাজার প্রশিক্ষিত গুণ্ডা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে একাজে অংশ নেয়। থানা পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। নোয়াখালি ও কুমিল্লা জেলার রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, সোনাইমুরি, রাইপুর ও সেনবাগ থানা সহ আরও অনেক এলাকা নিয়ে বিশাল অঞ্চল ঘেরাও করে হিংসার তাণ্ডব চললো অনেক দিন ধরে। হিন্দুদের ধর্মস্থান অপবিত্র করা ও ধ্বংস করা ছাড়াও অত্যাচারের এমন কোন ধরন বাকি ছিল না যা এখানে ঘেরাও হওয়া হিন্দুদের উপর প্রয়োগ করা হয়নি। হত্যা, লুঠপাট, গণধর্ষণ, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্মান্তকরণ। হিন্দু অঞ্চল ঘেরাও করে অর্থাৎ পালিয়ে যাওয়ার সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে, অসংখ্য হিন্দু মেয়েকে তারা বিয়ের নামে রক্ষিতা করে নিয়েছে। হিন্দুরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তাগুলি খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। জলপথে যাতে অপবিত্র পৌত্তলিক হিন্দুরা পালিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল নৌকার মাঝিদের দিয়ে। ঐ মাঝিরা ছিল সবাই মুসলমান।'[ix]

নোয়াখালির এই ভয়ঙ্কর নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর হিন্দু দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের (যিনি মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান দাবির অন্যতম সমর্থক ছিলেন) নেতৃত্বে ২১ শে অক্টোবর কয়েকজন মন্ত্রী ও লীগ নেতাদের নিয়ে গঠিত একটি তদন্তকারী দল পাঠানো হয়। অদ্ভুতভাবে তাঁরা নোয়াখালির ঘটনাটি যথাসম্ভব হালকা করে দেখিয়ে তাঁরা তাদের তদন্ত রিপোর্ট জমা দিলেন। যেন চিন্তায় ফেলার মতো কোন ঘটনা নোয়াখালিতে ঘটেনি।[x] এরপর নোয়াখালিতে গান্ধীজীর অভিজ্ঞতা সংগ্রহের পালা। অনেক সময়ই দেখা গেছে যে, গান্ধীজী মুসলিমদের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতি উদাসীনতা দেখিয়েছেন বা ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে সমস্যা সমাধানের সহজ ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু নিধন হয়ে যাওয়ার পর তিনি বললেন-

"এখন আমার নীরব থাকাই বাঞ্ছনীয়।" গান্ধীজী আরো বলেন যে, "আমরা ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে যাই। এটা উচিত নয়। যারা পালিয়ে যায় ঈশ্বরের উপর তাদের বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর যখন আমাদের অন্তরে আছেন, তখন পালিয়ে যাবার প্রয়োজন কোথায়? মানুষ যখন মারা যায়, তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই এটা ঘটে। আমাদের যদি কেউ পেটায় তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরই এটা ঘটান। যে ব্যক্তি সব সময়ই ঈশ্বরের কথা ভাবে সে পালিয়ে বাঁচতে যাবে কেন?"[xi]

গান্ধীজী মনে করেছিলেন যে এমন অহিংস আদর্শের কথা ঘোষণার মাধ্যমেই বুঝি বাংলায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের অবসান ঘটবে। কিন্তু নোয়াখালিতে গিয়ে অবস্থার উত্তাপ উপলব্ধি করতে গান্ধীজীর সম্ভবত খুব একটা অসুবিধা হয়নি। ১১ই নভেম্বর মুসলিম জনসাধারণের এক সভায় গান্ধীজী তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন-

"আপনারা কি চান না যে, যে সমস্ত হিন্দুরা তাঁদের ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন তারা আবার স্ব স্ব গ্রামে ফিরে আসুক এবং আপনাদের সঙ্গে আগের মত পাশাপাশি শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়ে বসবাস করুক?" কিন্তু সভার কেউ কোন উত্তর দেননি। "হিন্দু-মুসলমানের প্রতীক গান্ধীজী সাধ্যমত চেষ্টা করেও এই সভায় মুসলমানদের কাছ থেকে কোন উত্তর আদায় করতে পারেননি।'[xii]

তাই নোয়াখালির হিন্দুদের অবস্থা বেগতিক বুঝে পরবর্তীকালে তিনি পথ পাল্টালেন। নোয়াখালির হিন্দুদের তিনি বললেন, "নোয়াখালি ত্যাগ করো, নইলে মরবে।"**New York Times**পত্রিকায় ***'QUIT NOAKHALI OR DIE, GANDHI WARNS HINDUS*** শিরোনামে গান্ধীজী বক্তব্য ছাপিয়ে এই সংবাদ প্রকাশিত হল-

> *NEW DELHI. India, April 7 (AP)-Mohandas K. Gandhi, who has been attempting to Insure communal peace in the· Bengal and Bihar areas, said today religious strike in the troubled Noakhali section of Bengal seemed to call for Hindus to leave or perish "In the flames of fanaticism." ⋯ Mr. Gandhi hailed his walking tour of Bengal and Bihar at the Invitation of the new Viceroy. Viscount Mountbatten. for discussions: on departure of the British from. India, by June, 1945. Today he released telegrams from Congress party workers in Noakhali. which is predominately Moslem, in which they described attempts to burn Hindus alive.*[xiii]

নোয়াখালির একজন বাসিন্দা অমৃত বাজার পত্রিকার সাংবাদিককে বলেছিলেন যে, সেখানকার ৯৫ শতাংশ হিন্দু ইতিমধ্যে চলে গেছে। তিনি সেখানে পড়ে থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন না। হিন্দু বাবুরা সবাই এভাবে দেশ ছেড়ে চলে আসায় তাদের উপর নির্ভরশীল নিম্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুরা বেকার হয়ে পড়েছে। তাদের পক্ষে সেখানে পরে থাকার অর্থ মৃত্যুর সামিল।[xiv] এই পরিস্থিতিতে দেশভাগের পর পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখরা যদি সেখানে থাকতে না পারেন তবে তাঁরা ভারতের মাটিতে আশ্রয় পেতে কোন অসুবিধায় পড়তে না হয় সে কথা গান্ধীজী স্বাধীনতা লাভের পর ভেবেছিলেন। তাই স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজী দিল্লির এক প্রার্থনা সভায় বলেছিলেন যে, "হিন্দু ও শিখ যাহারা ওখানে আছে তাহারা যদি আর সেখানে থাকিতে না চায় তাহা হইলে তাহারা যে কোন ভাবে এখানে আসিত পারে। সেক্ষেত্রে ভারত সরকারের প্রথম কর্তব্য হইবে তাহাদের জন্য কাজের সংস্থান করা এবং তাহাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় করা।"[xv] ১৯৪৬ সালের নোয়াখালির দাঙ্গার পর থেকেই পূর্ববাংলার হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাবে ভুগতে শুরু করেছিল। ভবিষ্যতে পূর্ববাংলায় হিন্দুদের জীবন ও ধর্মের নিরাপত্তা কতটা থাকবে তা তখন থেকেই সেখানকার হিন্দুরা সন্দিহান হয়ে পড়েন। তাই নোয়াখালি দাঙ্গার পর থেকেই কিছু কিছু হিন্দু পশ্চিমবাংলায় আসতে শুরু করেছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যে পূর্ববাংলার হিন্দুদের কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্ট অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা লীগের নেতৃত্বে কলকাতায় ১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্টে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' দাঙ্গা দেখেছিলেন, ছেচল্লিশে নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হিন্দু নিধন যজ্ঞও দেখেছিলেন। কিন্তু তবু অনেকে আশা করেছিলেন যে, আর যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত দেশভাগ অর্থাৎ পৃথক পাকিস্তান হয়তো হবে না। কেননা গান্ধীজী নিজে কথা দিয়েছেন যে, দেশ ভাগ হলে তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে ভাগ হতে হবে। তিনি ১৯৪৭ সালের ৩১ শে মার্চ বললেন, "আমার মৃতদেহের উপর দিয়া ছাড়া কংগ্রেস ভারতে দুইটি রাজ্য অর্থাৎ পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি ইহাতে সম্মতি দিব না।"[xvi] তিনি বললেন যে, *'Partition means a patent untruth'*। অতএব যিনি দেশভাগের

কথা মোটেই ভাবছেন না তার পক্ষে সেই সব কথাও ভাবা নিশ্চয়ই সম্ভব না যে, সত্যিই যদি দেশ ভাগ হয় তবে উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের কী অবস্থা হবে। তাই মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের তীব্র শক্তিতে যখন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশ ভেঙ্গে মুসলিমদের জন্য পৃথক পাকিস্তানের সৃষ্টি হল তখন পূর্ববাংলার সংখ্যালঘুরা ভীষণ অসহায় হয়ে পড়লেন। তাঁরা আর দেশনেতাদের কথায় ভরসা রাখেন কী করে? দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিমদের জন্য পৃথক পাকিস্তান মানে তো পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববাংলা এখন থেকে মুসলিমদের জন্য হয়ে গেল। অতএব এখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের আর থাকার উপায় নেই।

স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরপরই পশ্চিম পাঞ্জাবে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছে তেমন ভয়ানক দাঙ্গ পূর্ববাংলায় তখন হয়নি। এই পর্বে পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুদের চলে আসার প্রধান কারণ ছিল পাঞ্জাবী পুলিশ, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড এবং গুণ্ডাদের হামলা ও হুমকি। "দেশভাগ ঠিক হয়ে যাওয়ার পরই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু মুসলমান বলতে থাকে, পাকিস্তানটা হতে দাও, তারপর হিন্দুদের ব্যবস্থা হবে। দারুণ প্যানিক তখন হিন্দুদের মনে।"[xvii] ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ববাংলার হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্মভূমি পরিত্যাগের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রচন্ড রকমের দাঙ্গা পূর্ববাংলায় না হলেও যে বিপুল পরিমাণ উদ্বাস্তু তখন পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের কাছে গিয়ে কিছু ঘটনার কথা শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে শুনে এলেন। তিনি প্রশাসনিক কাজে আলিপুর দুয়ারে গিয়ে পূর্ববাংলা থেকে সদ্য আগত প্রচুর হিন্দু উদ্বাস্তুদের মুখোমুখি হন। তখন পূর্ববাংলায় তেমন বড় ধরনের দাঙ্গার কোন খবর পাওয়া যায়নি। তবে তারা কেন জন্মভূমি ছেড়ে এখানে এভাবে দুর্যোগের জীবন কাটাচ্ছেন? তাঁর প্রশ্নঃ "নিজের দেশ ছেড়ে স্বেচ্ছায় এত কষ্ট বরণ করবার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি?" কিন্তু কয়েকজন উদ্বাস্তুর কাছ থেকে পূর্ববাংলায় হিন্দুদের উপর নির্যাতনের বিভিন্ন টুকরো ঘটনা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কয়েকটি টুকরো ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলঃ

(ক) বগুড়া জেলা থেকে আগত এক ডাক্তারের কাছ থেকে শুনলেন পাকিস্তান হওয়ার পর রাস্তাঘাটে, দোকানে কীভাবে মুসলিমদের কাছে তাদের অপমানিত হতে হচ্ছে। তিনি পরিচিত এক মুদি দোকানে গিয়ে এক বস্তা সরু চাল কিনলেন। প্রতিবেশি কালু মিঞা সেই চালের বস্তাটি নিতে চাইলেন। কেননা দোকানে যেহেতু মাত্র এক বস্তা চালই আছে, তাই কালু মিঞাকেই তা দিতে হবে। ডাক্তার ভদ্রলোক বললেন, তিনি সেই চাল কিনে দামও মিটিয়ে দিয়েছেন, "কাজেই সেটা কি করে হয়?" কালু মিঞা নাকি হুঙ্কার দিয়ে বললেনঃ "আলবৎ হয়। একি হিন্দুস্থান পেয়েছ? বলে জোর করেই বস্তাটা কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন।"[xviii]

(খ) বগুড়ার সেই ডাক্তারের এক পুরানো প্রজা (আগে দেখা হলে এরাই দশ হাত দূর থেকে অন্তত দশবার সেলাম ঠুকত) পাকিস্তান হওয়ার পর একদিন তাঁর বাড়িতে এসে বললেন, "কর্তা, ইংরেজ চলে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের পাকিস্তান হয়েছে। তাই দোস্তানি করতে এলাম। . . . কর্তা, এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে। মনে রেখ, আমরা আর ছোট নই। ভুলে যেও না, এখন থেকে সমানে সমানে আমাদের সঙ্গে মিতালি করতে হবে।"[xix]

(গ) ইতিমধ্যে জড়ো হওয়া উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকে আর একজন বলতে শুরু করলেন-

"হিন্দুর মেয়েরা ঘাটে স্নান করতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক পাড়ে এসে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে বয়সে নবীন যুবক যেমন আছে, তেমন বয়সে প্রবীণ প্রৌঢ়ও আছে। দাঁড়িয়ে নাকি তারা ছড়া কেটে গান ধরে। এক পাড়ের লোক গায়ঃ

- পাক পাক পাকিস্তান,

আর অন্য পাড়ের লোক বলে,

- হিঁদুর ভাতার মুসলমান।

এই অদ্ভুত আচরণে যে মেয়েটি স্নান করতে জলে নেমেছে সে স্বভাবতই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। নির্যাতনকারীদের মতে তার সেই আচরণ ভারি কৌতুকবোধ জাগায়। তারা হেসে কুটিকুটি হয়। এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে না। তারপর নাকি ঘাটের দিকে একজন প্রৌঢ় পুরুষ এগিয়ে এসে বলেঃ

- ও বিবি, বেলা যে বেড়ে চলল। আর দেরী কেন? এবার ঘরে চল। সে কথা শুনে মেয়েটি ভয়ে আরও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। আবার ওদিকে হাসির হুল্লোড় বয়ে যায়। তখন সেই প্রৌঢ় মানুষটি এক নবীন সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলেঃ

-ওরে, তোর চাচীর পায়ে বুঝি খিল ধরেছে। উঠতে কষ্ট হচ্ছে। হাত ধরে তুলে নিয়ে আয় না।"[xx]

(ঘ) দেশভাগের পর থেকেই হিন্দুদের সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আসা প্রসঙ্গে শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "নিজের ভিটেমাটি কেউ সহজে ত্যাগ করে না। এরা যে করেছে, তা বাধ্য হয়েই করেছে। এরা ভদ্রশ্রেণীর উন্নত রুচির মানুষ। এদের অপমানবোধ তীক্ষ্ন। তাই অত্যাচার চরমে ওঠবার আগেই, যখন তা মানসিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ তখনি তারা চলে এসেছে। এইসব ভেবে আমার মন সেদিন আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বলেছিলাম- হায় ভগবান, শুরুতেই এমন হল, পরে না জানি কি দাঁড়াবে।"[xxi]

১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববাংলায় মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪২ মিলিয়ন। এর মধ্যে সংখ্যালঘু অমুসলিমদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ২৯.৫ শতাংশ। এই অমুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যে অবশ্য হিন্দুরাই ছিল অধিকাংশ, প্রায় ৯৯ শতাংশ। বাকি এক শতাংশ ছিল বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু দেশভাগের পর অতি দ্রুত হারে কমতে থাকে। এর কারণ মূলত দ্বি-জাতি তত্ত্ব। অর্থাৎ পাকিস্তান মুসলিমদের জন্য। ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, মূলত হিন্দুদের দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তান শাসনকালে পূর্ববাংলা থেকে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু হিন্দু দেশান্তরী হয়।[xxii]

টেবিল ১: ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্তু আগমন[xxiii]

সময় কাল	**উদ্বাস্তু সংখ্যা**	**উদ্বাস্তুদের পেশাগত পরিচিতি**	**পেশাগত সংখ্যা**
১৯৪৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত	১০ লক্ষ	এর মধ্যে শহুরে মধ্যবিত্ত	৩ লক্ষ ৫০ হাজার
১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত	১১ লক্ষ	গ্রামীণ মধ্যবিত্ত	৫ লক্ষ ৫০ হাজার
১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত		কৃষক	১ লক্ষের কিছু বেশি
১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত		কৃষির সঙ্গে যুক্ত কারিগর ও অন্যান্য	১ লক্ষের কিছু কম

১৯৪৬-১৯৪৭ সময়কালে পূর্ববঙ্গে শহরের সংখ্যা অনেক কম এবং গ্রামের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তখন তাই শহর ও গ্রামের জনসংখ্যার অনুপাতেও বিস্তর ফারাক ছিল। গ্রামে জনসংখ্যা অনেক বেশি ছিল। অথচ প্রথম পর্যায়ে আসা মধ্যবিত্ত উদ্বাস্তুদের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এই সময় শহুরে ও গ্রামীণ উদ্বাস্তুর অনুপাত ছিল ৭ : ১১। অর্থাৎ শহুরে জনসংখ্যার অনুপাতে শহুরে উদ্বাস্তুদের আগমনের মাত্রা অনেক অনেক বেশি। দেশভাগের অব্যবহিত পরেই কোন দাঙ্গা না হলেও শহুরে মধ্যবিত্ত হিন্দুরা জীবন ও ধর্মের নিরাপত্তার অভাবের এবং মান-মর্যাদা নষ্ট হওয়ার একটি আতঙ্কে ভুগছিলই। আর্থিক সঙ্গতি থাকায় তারা আগে থাকতেই ভারতে পাড়ি দেয়। সেই তুলনায় গ্রামীণ মধ্যবিত্তরা গ্রামের মাটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকেন বলে তখনই গ্রাম ছেড়ে ব্যাপক মাত্রায় দেশত্যাগ করতে পারেনি। গ্রামের মানুষের জীবিকা অনেকাংশেই গ্রামের স্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে সহসাই সেই স্থান ত্যাগ করে প্রথম দাঙ্গাতেই আসা সম্ভব নয়। প্রথম পর্যায়ে গ্রামীণ মানুষের তুলনামুলক কম দেশত্যাগের আর একটি কারণ হল : শহরের শিক্ষিত মানুষের চেয়ে সচেতনতায় গ্রামের মানুষ পিছিয়ে ছিল। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পর শহরের মানুষ যে হারে দেশ ছেড়েছে সেই হারে গ্রামের মানুষ দেশ ছাড়েনি। গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ভেবেছিল যে দাঙ্গা একসময় থেমে যাবে এবং সাত পুরুষের জন্মভিটাতেই ভালবেসে বসবাস করা যাবে।

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন যে ১৯৪৮ সালের ১৬ আগস্ট (অর্থাৎ মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণার দ্বিতীয় বার্ষিকী) ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত এক সম্মেলনে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দেশ ত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের ব্যাখ্যা প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'প্রান্তিক মানবঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা' গ্রন্থে এইভাবে উল্লেখ করেছেন, "হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে আসছে তার কারণ ধর্মীয় অত্যাচার, হিন্দুদের প্রতি অমানবিক আচরণ, পক্ষপাতদোষদুষ্ট প্রশাসন। হিন্দুদের পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসাকে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম ও মর্মান্তিক উদ্বাসন বলে চিহ্নিত করেছেন।"[xxiv]

সূত্রনির্দেশ:

[i]. শ্রীদেবজ্যোতি রায়, *কেন উদ্বাস্তু হতে হল,* দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৫, বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা- ২৩। [মূল গ্রন্থ- Stern Reckoning, G. D. Khosla, Oxford University Press, New Delhi- 110001]

[ii]. শ্রীদেবজ্যোতি রায়, তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪।

[iii]. শ্রীদেবজ্যোতি রায়, তদেব, পৃষ্ঠা- ২৩।

[iv]. G. D. Khosla, *'Stern Reckoning'*, Oxford University Press, ... New Delhi- 110001, Page- 313-14|

[v]. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, *দেশভাগ দেশত্যাগ,* প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪, অনুষ্টুপ, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা- ৪১।

[vi]. শ্রীদেবজ্যোতি রায়, তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮।

[vii]. L. Collins & d. Lapierre, *'Mountbatten and the Partition of India'*, Vol. I, 1982, ... Page- 33.

[viii]. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, *'প্রান্তিক মানবঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুজীবনের কথা',* প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩১ এবং ২৬শে জানুয়ারী, ২০১১ তারিখে গৃহীত প্রফেসর ডঃ রাখালচন্দ্র নাথ মহাশয়ের সাক্ষাৎকার, আনন্দপুরী, ব্যারাকপুর, কলকাতা- ১২২, বিষয়ঃ ভারত বিভাজন ও পূর্ববাংলার হিন্দু উদ্বাস্তু।

[ix]. শ্রীদেবজ্যোতি রায়, তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮।

[x]. The Statesman, 25.10.1946.

[xi]. The Govt. of India, *'The Collected Works of Mahatma Gandhi'*, Vol. 85. 1982, ... Page- 220|

[xii]. শ্রীদেবজ্যোতি রায়, তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১-৩২।

[xiii]. New York Times, April 8, 1947.

[xiv]. *Amrtia Bazar Patrika*, 8 October, 1948. পুনরুল্লেখ- Prafulla Chakrabarti, *The Marginal Men.* 1990. Lumiere Books, Calcutta, p-13.

[xv]. The Govt. of India, *'The Collected Works of Mahatma Gandhi'*, Vol. 89. 1982, ... Page- 246|

[xvi]. শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', ২য় সংস্করণ- ১৯৮২, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পা. প্রাঃ লিঃ কলকাতা- ১৩, পৃষ্ঠা - ৪৩৬।

[xvii]. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃষ্ঠা- ৬২-৬৩।

[xviii]. শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *'উদ্বাস্তু'*, প্রথম সংস্করণ- ১৯৭০, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, পৃষ্ঠা- ১৪।

[xix]. শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪-১৫।

[xx]. শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫-১৬।

[xxi]. শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬।

[xxii]. R. P. Sharma & Sitangshu Guha, Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council-USA, *Religious Minorities* And *National Election of Bangladesh,*January, 2006|

[xxiii]. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, তদেব, পৃষ্ঠা- ১২।

[xxiv]. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, তদেব, পৃষ্ঠা- ১২।

লেখক পরিচিতি:

ড. সুভাষ বিশ্বাস নদীয়া জেলার বাসিন্দা। তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা শেষ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কার সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজে এবং কলকাতার বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে গবেষণার কাজ করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বিভিন্ন জার্নাল ও বইপত্রে তার বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বর্তমানে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত।